ক ন ফে শ ন

স্বীকারোক্তি

আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিগদ্য

কনফেশন

স্বীকারোক্তি

লিও তলস্তয়

ভাষান্তর

ইমরান খান

বেঙ্গলবুকস

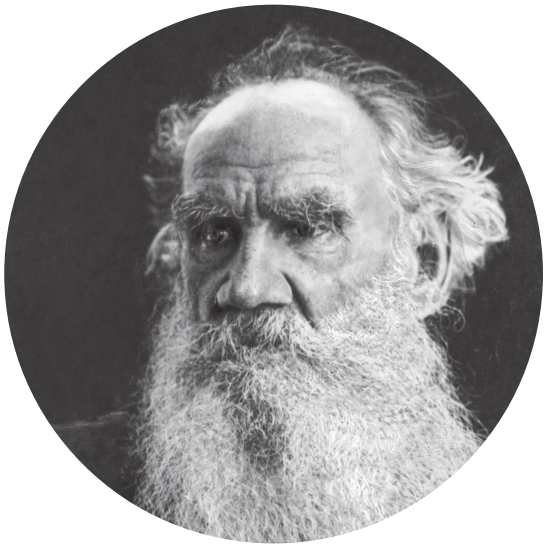

ভূমিকা

‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ এবং ‘আন্না কারেনিনা’ দুটি গৌণ সাহিত্যকর্ম। অবাক হচ্ছেন? আরো ধাক্কা খাবেন যদি বলি এই মন্তব্য স্বয়ং ঔপন্যাসিকের। বড় লেখকরা বিনয়ী হন। সেই বিনয় থেকে তাঁরা মাঝেমধ্যে বলে থাকেন, ‘কী আর লিখলাম বলুন? তেমন কাজের কিছু লিখিনি।’ এই গ্রন্থে ঔপন্যাসিক সে অর্থে নিজের লেখাকে গৌণ বলেননি, বিশ্বাস থেকে বলেছেন।

১৮৭৯ সালের হেমন্তকাল। ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ এবং ‘আন্না কারেনিনা’র মতো কালজয়ী উপন্যাসের লেখক লিও তলস্তয় নিজের ভেতর এক ধরনের আধ্যাত্মিক বিবর্তন অনুভব করলেন, তাঁর অন্তর্দর্শন হলো। সেই উপলব্ধি কাঁপিয়ে দিল তাঁর অস্তিত্বের ভিত্তি। তলস্তয়ের অন্তরাত্মা তাঁকে বলল যে জীবনে তাঁর কোনো অর্জন নেই এবং তাঁর জীবনটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এমনকি তিনি নিজেকে আর লেখক হিসেবে ভাবতেই চাইলেন

না! উপরোক্ত দুটি উপন্যাসই তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে অমর করেছে এবং দুটিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা এবং সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ। বিশ্বের সেরা দশটি উপন্যাসের তালিকার প্রথম দিকেই এই উপন্যাস দুটির নাম উচ্চারিত হয়। 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' এবং 'আন্না কারেনিনা'র মতো উপন্যাসও যদি একজন লেখকের জীবনকে অর্থবহ না করতে পারে তাহলে জীবনের অর্থ আসলে কোথায়? এই প্রশ্নের সাথে আরো বহুমুখী আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তলস্তয় উত্থাপন করেছেন তাঁর 'কনফেশন'-এ। জীবনের অর্থ কী? এই প্রশ্নের কোনো অর্থবহ উত্তর তলস্তয় ধর্ম বা বিজ্ঞানে খুঁজে পাননি, এমনকি দর্শনেও না। মুখস্তবিদ্যার মতো করে কোনো সমাধান গ্রহণকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আমি কে? পৃথিবীতে একবার জন্ম নিয়ে মৃত্যুকে সামনে রেখে একটিমাত্র মানবজনম পেয়ে একজন মানুষের আসলে নিজেকে নিয়ে কী করা উচিত? আমার জন্ম না হলে কী হতো?—এসব প্রশ্নই পরবর্তীকালের লেখকদের প্রভাবিত করেছে। আলবেয়্যার কামু তাঁর 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস' গ্রন্থের প্রথম বাক্যেই বলেছেন, 'জগতে সত্যিকার অর্থে দার্শনিক প্রশ্ন একটিই আছে, আর তা হলো আত্মহত্যা।' মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রশ্ন চিরকালীন, প্রাচীনতম এবং চিরনবীন। আমি আত্মহত্যা কেন করব না? আমার বেঁচে থাকার অর্থ কী? প্রতিটি মানুষকে জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে, কোনো না কোনো রূপে, কোনো না কোনো কারণে এই প্রশ্ন নিজের দিকে ছুড়ে দিতে হয়। দীর্ঘদিন আত্মহত্যা প্রবণতায় ভুগতে ভুগতে তলস্তয় লিখেছিলেন তাঁর এই খুব ছোট অথচ শক্তিশালী গ্রন্থ 'কনফেশন'।

'কনফেশন' বইটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তলস্তয়ের মহত্তম এবং দুঃসাহসিক উচ্চারণ। এই উচ্চারণ জীবনের গূঢ়তম বিহ্বলতায় আক্রান্ত একটি আত্মার কাহিনি। এখানে মানুষের সাথে অসীমের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে আর সেটি করা হয়েছে সম্পূর্ণ অকপটভাবে এবং উন্নত শিল্পগুণের মাধ্যমে। বইটি পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তলস্তয় এখানে নিজের মনোজগতকে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছেন। আত্মজীবনীতে যে আত্মসমর্থন থাকে, এখানে তা নেই। তিনি সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন নিজের। প্রচলিত অর্থে এটি আত্মজীবনী নয়, বরং মধ্যবয়সের একধরনের আত্মিক সংকটের বিশ্লেষণ, যে সংকট শুরু হয়েছিল লেখকের যৌবনে। সুতরাং 'কনফেশন' বইটি তলস্তয়ের লেখক হিসেবে নিজেকে পুনঃআবিষ্কারের দলিল। ১৮৮০ সালের পর থেকে তাঁর সমগ্র মনোযোগ ছিল জীবনের গভীরতম এবং আধ্যাত্মিক অর্থবহতার প্রতি। তাঁর মতে, এই অর্থ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রাম্য কৃষক এবং প্রান্তিক জনতার মাঝে, সেটাও ক্ষণিকের জন্য।

'আন্না কারেনিনা' প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর পরেই 'কনফেশন' প্রকাশিত হয় আর সেই দুই বছরেই তলস্তয়ের মনোজগতে যে মোড় ঘোরানো পরিবর্তন এসেছিল তা এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট। এখানে তিনি জীবনের অর্থ আর সেইসাথে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে সুগভীর আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছেন। 'কনফেশন' গ্রন্থে তিনি যে আত্মিক সংকটগুলো নিয়ে কথা বলেছেন, সেই সংকটগুলোর প্রতিফলন আমরা তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মগুলোতে দেখতে পাই, যেমন 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', 'ফাদার সার্জিয়াস',

'মাস্টার অ্যান্ড ম্যান' এবং 'পুনরুত্থান'।

১৮৭৭'র শেষের দিকে তলস্তয় বিশ্বাস আর যুক্তির সংঘাত নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবজীবনের অন্যতম একটি চিরন্তন সংকট হলো সে ঈশ্বরের উপাসনা করবে নাকি জাগতিক সাফল্য আর সম্পদের? একইসাথে দুজন দেবতার উপাসনা করা যায় কি, বিশেষ করে যদি তাঁরা হন বিপরীত চরিত্রের? আপাতদৃষ্টিতে আত্মিক উৎকর্ষতাকে সহজে বেছে নেয়ার মতো মনে হলেও আসলে কি ততটা সহজ? ১৮৭৯ সালে তিনি নিজের মনোজগতকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য কিয়েভের কেভ্ মনাস্টেরিতে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান। সেখানে তিনি সরল জীবনযাপনকারী কিছু সন্ন্যাসীর দেখা পান, যাঁরা 'প্রাচীন খ্রিষ্টীয় পদ্ধতি'তে জীবনযাপন করত। ওখান থেকে ফিরে তিনি সনাতন গির্জার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেন যে গির্জাগুলো গসপেলের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও তলস্তয় এই বইয়ে বারবার খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে তাঁর আত্মিক সংঘাতের কথা বলেছেন, রচনাগুণে এটি হয়ে উঠেছে শুধু খ্রিষ্টান নয়, যেকোনো অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মব্যবসার সমালোচনা।

ধর্ম মানে স্বভাব। জলের ধর্ম গড়িয়ে চলা, বাতাসের ধর্ম প্রবাহিত হওয়া। তেমনি মানুষেরও ধর্ম আছে, যা পালন না করলে অধর্ম হয়। ধর্ম কোনো সম্পত্তি নয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে মুফতে পাওয়া যাবে। মানুষকে সবই অর্জন করতে হয়, তার জন্য কিছুই 'ফ্রি' নয়। একটি বাছুরও জন্মের

আধাঘণ্টার মধ্যে ল্যাগব্যাগ করে দাঁড়িয়ে যায়। মানুষকে আছাড় খেয়ে খেয়ে হাঁটা শিখতে হয়, অন্য প্রাণীদের মতো জন্মসূত্রেই সে সাঁতার জানে না। কাজেই ধর্ম কেন বিনামূল্যে হবে? একজন মানুষের ধর্ম কী, সেটা তাকে সাধনার বলে অর্জন করে নিতে হয়।

এই গ্রন্থে ধর্ম বলতে তলস্তয় শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা বলেননি, বলেছেন জীবনের কোনো একটা উদ্দেশ্যের কথা, যার জন্য বেঁচে থাকা যায়। আমি পৃথিবীতে কেন আছি? আমি যখন ছিলাম না, পৃথিবী কি আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল? আমি যখন থাকব না, পৃথিবীর কি কিছু ঘাটতি পড়বে? ওপরের প্রশ্ন দুটোর উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে আমি কি একটা ফাঁপা অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীতে হাস্যকরভাবে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি? এসব গূঢ় প্রশ্নের উত্তরই তলস্তয় মধ্যবয়স থেকে মৃত্যুর আগ অবধি খুঁজেছেন। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন যে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন দুটো; এক হলো তার জন্মের দিন আর দুই হলো যেদিন সে আবিষ্কার করে সে কেন জন্মেছিল। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিনটা তো সবার ভাগ্যেই জোটে, কিন্তু দ্বিতীয়টা? সত্যি কি মানুষ জানে তার জীবন কেমন হওয়া উচিত? আসলেই কি বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাসের সাথে তার দৈনন্দিন জীবনের কোনো সামঞ্জস্য আছে? অথবা তার বিশ্বাসটা কি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস? বিশ্বাস কি অন্ধ? নাকি যুক্তিসিদ্ধ? যদি অন্ধবিশ্বাসই বিশ্বাস হয় তাহলে মানুষ হয়ে জন্মে লাভটা কী? অন্ধবিশ্বাসের জন্য তো বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। আর যুক্তিবাদী হলে বিশ্বাস করার মতো ভিত্তি খুঁজে পাওয়াটাই হয়ে

দাঁড়ায় জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ। মানুষের আত্মিক এবং বস্তুগত জীবনে যুক্তি আর বিশ্বাসের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? তার কি আগে বিশ্বাস করে তারপর সেই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো উচিত নাকি যুক্তি থেকেই ধাবিত হওয়া উচিত বিশ্বাসের দিকে?

তলস্তয় কি শেষ অবধি জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন? সেটা পাঠক বিবেচনা করবেন। কিছু একটা তো তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, এই বইয়ের শেষে উল্লিখিত স্বপ্নে সে কথা আছে। তবে ইতিহাসের ভিত্তিতে এটুকু বলা যায় যে তিনি মৃত্যুর (১৯১০ খ্রি.) আগ পর্যন্ত অনুসন্ধান জারি রেখেছিলেন। তাঁর জীবনে অনুসন্ধান আর আবিষ্কার পাশাপাশি চলেছে। বরং বলা যায় অনেক সময় খুঁজে পাওয়ার চেয়ে অনুসন্ধান জারি রাখাই জীবনের অর্থবহতা এবং উত্তর পাওয়া যাবে কি না তা না ভেবেই জীবনকে প্রশ্ন করতে থাকা বেশি জরুরি। প্রশ্ন করাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার ফলে মানুষ নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জন্ম হয় 'কনফেশন'-এর মতো গ্রন্থের। নিজেকে স্বীকার করে না নেয়ার দলিল এই 'স্বীকারোক্তি' বা 'কনফেশন'।

ক ন ফে শ ন

প্রথম অধ্যায় ১৫ দ্বিতীয় অধ্যায় ২২
তৃতীয় অধ্যায় ২৯ চতুর্থ অধ্যায় ৩৬
পঞ্চম অধ্যায় ৪৪ ষষ্ঠ অধ্যায় ৫৪
সপ্তম অধ্যায় ৬৪ অষ্টম অধ্যায় ৭২
নবম অধ্যায় ৭৭ দশম অধ্যায় ৮৫
একাদশ অধ্যায় ৯০ দ্বাদশ অধ্যায় ৯৫
ত্রয়দশ অধ্যায় ১০২ চতুর্দশ অধ্যায় ১০৯
পঞ্চদশ অধ্যায় ১১৫ ষোড়শ অধ্যায় ১২১

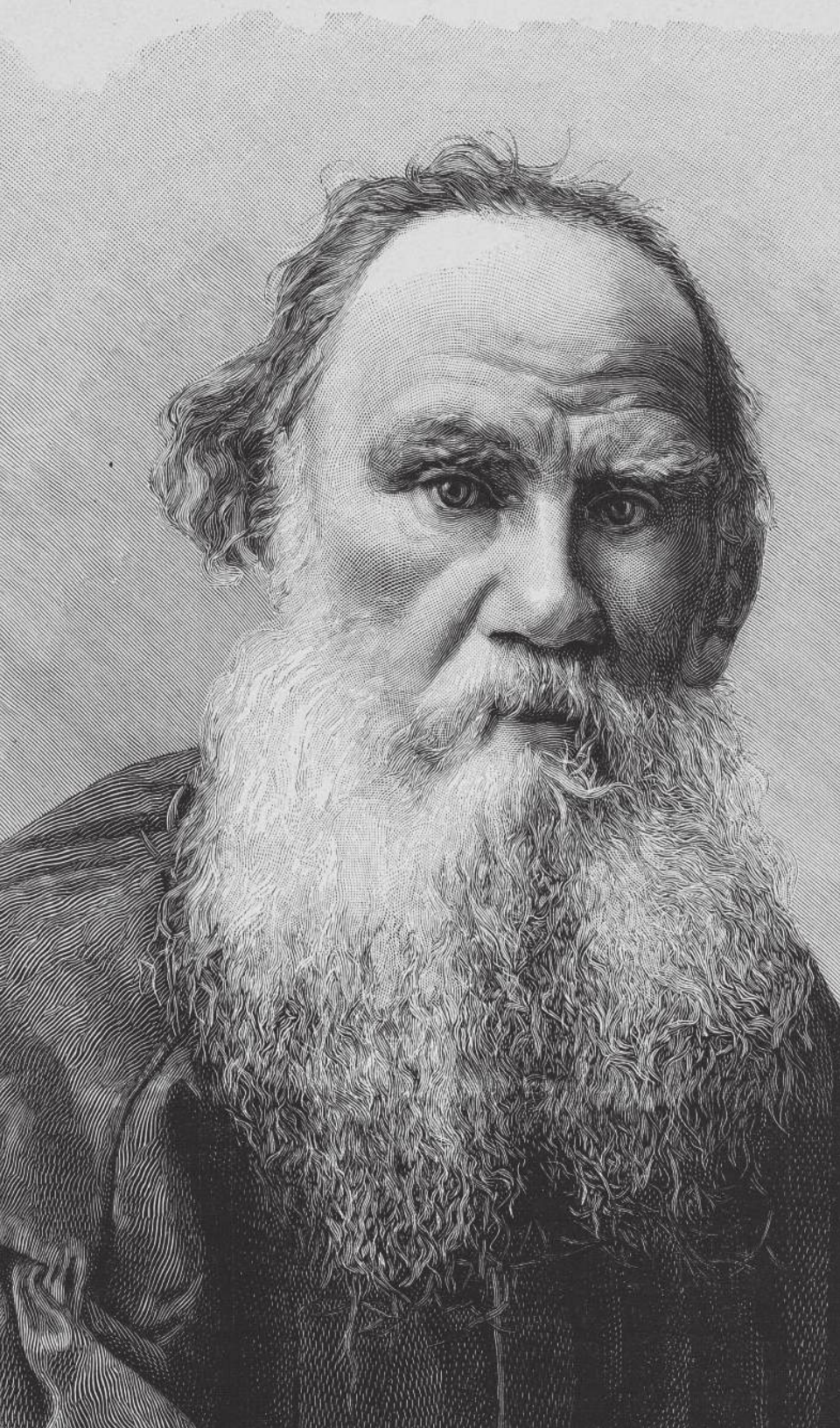

প্রথম অধ্যায়

আমি প্রথাগত অর্থডক্স খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত হয়েছিলাম। শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিজুড়েই আমার শিক্ষার ভিত্তি ছিল প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস। আঠারো বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিই এবং আঠারো বছর ধরে জীবনে যা কিছু শিখেছিলাম, সবকিছুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

বর্তমানে যদ্দূর মনে করতে পারি, আমি কখনোই সে অর্থে ঐকান্তিকভাবে ধর্মবিশ্বাসী ছিলাম না। আমাকে যা শেখানো হয়েছিল আমি তোতাপাখির মতো তা-ই শিখেছিলাম এবং বয়োজেষ্ঠ্যরা যে বিশ্বাসে আটকে ছিলেন আমিও তাতেই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেই বিশ্বাসও ছিল খুব নড়বড়ে।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমার বয়স তখন এগারো। ভলোডিনকা এম নামে আমাদের স্কুলের একটি ছেলে ছিল, সে এখন মৃত। এক রবিবারে সে স্কুলে এসে আমাদেরকে বলল যে বিজ্ঞানীরা একটা বিরাট সত্য আবিষ্কার করেছেন। সত্যটি হচ্ছে ঈশ্বর বলে কারো অস্তিত্ব নেই এবং ধর্মগুরুরা আমাদের যা কিছু শেখাচ্ছেন সেসব রূপকথা ছাড়া কিছু

• *এনগ্রেভিং, শিল্পী এরনেস্তো মানকাসত্রোপা*

নয়। আমি ১৮৩৮ সালের কথা বলছি।[১] আমার মনে আছে এই বিশেষ আবিষ্কারটি আমার বড় ভাইদেরকে মারাত্মক প্রভাবিত করেছিল। এমনকি ওদের আলোচনায় আমাকে অংশগ্রহণের বিরল সুযোগ ওরা দিয়েছিল। সাধারণত আমাকে ছোট জ্ঞান করা হতো এবং বড়দের কথাবার্তায় শামিল করা হতো না। আমার এ-ও মনে আছে যে আবিষ্কারের খবরটি শুনে আমরা খুব উদ্দীপিত হয়েছিলাম এবং আমাদের মনে হয়েছিল বিষয়টা খুব কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঈশ্বর বলে কেউ থাকবেন না এটাই স্বাভাবিক।

সেইসাথে মনে পড়ছে আমার বড় ভাই দিমিত্রি'র কথা। সেই সময় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জীবনাসক্তি। খুব আবেগী মানুষ ছিল সে। সে যা-ই করত নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে করত। হঠাৎই সে তার সমস্ত আবেগ, বিশ্বাস এবং আনুগত্য নিয়ে কঠোরভাবে ধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল—গির্জার সমস্ত উপাসনায় সে অংশ নিত, উপবাস করত এবং নিখাদ নৈতিকতার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করত। আমরা সকলে—এমনকি তার চেয়ে বয়সে যারা বড় ছিল তারাও—তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতাম এবং কোনো এক কারণে আমরা তার ডাকনাম দিয়েছিলাম 'নূহ'।

বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যেভাবে মানুষের সাথে বিশ্বাসের বিচ্ছেদ হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। আমাদের অভ্যস্ত কানে শুনতে অদ্ভুত ঠেকলেও বেশিরভাগ মানুষের সাথে তার বিশ্বাসের বিচ্ছেদ হয়ে যায় অথচ আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলেই ভাবতে থাকি। আমার মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে এরকম : একজন ব্যক্তি তার আশেপাশের মানুষগুলোর যাপিত জীবনকে অনুসরণ

১. ওই বছর ২৫ মে তলস্তয়ের দাদি মারা যান। তাঁর মৃত্যু তলস্তয়কে গভীরভাবে ব্যথিত ও ভীত করে। পরবর্তী কয়েক মাস তিনি তীব্র মৃত্যুভয় নিয়ে কাটিয়েছিলেন।

করেই বেঁচে থাকে, কিন্তু ওই মানুষগুলো সেইসব পোশাকি রীতিনীতিকেই ধর্ম বলে মানে যার সাথে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৈপরীত্য আছে। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যে শিক্ষা মানুষ আশৈশব পেয়ে থাকে, বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রয়োগ বা স্থান থাকে না এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কোনো ফলপ্রসূতা বয়ে আনে না। সোজা কথায় যাপিত জীবনে এই বিশ্বাস কোনো ভূমিকাই রাখে না। বিশ্বাস সম্পর্কে এই মানুষগুলো যা শেখে সেসবের বাস যেন অস্তিত্বের ভিন্ন কোনো স্তরে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জীবনবিমুখ। যদি কেউ এই ধরনের বিশ্বাসের মুখোমুখি হয়, সেটা যেন একটি ভাসা ভাসা আর জীবন থেকে বিযুক্ত ঘটনা।

অতীতে যা হতো এখনো তাই হয়—একজন মানুষের যাপিত জীবন এবং তার কর্ম দেখে বলার কোনো উপায় নেই যে সে বিশ্বাসী কি না, কেবল শারীরিক কসরত কখনো বিশ্বাসের পরিচায়ক হতে পারে না। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর মধ্যে যদি কোনো তফাৎ না থাকে তাহলে বিশ্বাসীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলার থাকে না। অতীতে এবং বর্তমানেও যেসব মানুষ সনাতন ধর্মকে সত্য ঘোষণা করেছে বা গির্জায় গিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তারা বেশিরভাগই সংকীর্ণমনা, নিষ্ঠুর এবং নৈতিকতা বিবর্জিত। তাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা নিজেরাই। অন্যদিকে বুদ্ধিমত্তা, সম্মান, সরলতা, সচ্চরিত্র এবং নৈতিকতা তাদের মধ্যেই বেশি দেখা গেছে যারা সমাজে অবিশ্বাসী বলে পরিচিত।

এভাবেই অতীতের মতো বর্তমানেও মানুষ নানান প্রয়োজন আর বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতার চাপে বিশ্বাসী হতে শেখে। একইসাথে বড় হতে হতে সে জীবনের পথে নানান জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। সেই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্বাস সম্পর্কে তার শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। সমাজ কাঠামোয় ধর্মবিশ্বাস চর্চা করা বেশ কঠিন। ধর্মশিক্ষা যে শুদ্ধতার কথা বলে, সমাজ কাঠামো ওই শুদ্ধতা দিয়ে চলে না। সমাজের সারবস্তুতেই

আমি জানতাম না সেই শিক্ষাগুলোর মূল ভিত্তি কী।

জীবনের সেই সময়টার দিকে যখন পেছন ফিরে তাকাই, আমি পরিষ্কার দেখতে পাই যে জৈবিক প্রবৃত্তি বাদে যে বিশ্বাস আমাকে প্রভাবিত করেছিল বা বলা যায় যাকে আমার একমাত্র সত্যিকার বিশ্বাস বলে মনে হয়েছিল তা ছিল খুঁতহীনতা বা উৎকর্ষ। নিজেকে যথাসম্ভব দেহমনে নিখুঁত করে তোলাই সবচেয়ে জরুরি মনে হতো। কিন্তু আমি বুঝতাম না যে ঠিক কী কী জিনিস দিয়ে খুঁতহীনতা তৈরি হয় অথবা এর উদ্দেশ্যই বা কী। আমি বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলাম; যা কিছু পড়ার মতো পেয়েছি পড়ে ফেলেছি, মনোজগতকে শুদ্ধ করার সাধনা করেছি এবং স্বসৃষ্ট কিছু নিয়মও মেনে চলার চেষ্টা করেছি। নিখুঁত শরীর গঠনের জন্য আমি সব ধরনের শারীরিক কসরৎ চর্চা করেছি যাতে আমার শক্তি এবং ক্ষিপ্রতা বাড়ে, সব ধরনের কষ্টকে মাথা পেতে নিয়েছি যাতে আমি একটা নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন করতে পারি আর আমার সহনশীলতা ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি পায়। এই সবকিছুই ছিল আমার কাছে খুঁতহীনতার সংজ্ঞা। সর্বাগ্রে অবশ্য নৈতিক খুঁতহীনতা স্থান পেয়েছিল আর খুব দ্রুতই সেই খুঁতহীনতার প্রতি নেশা আমার জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ, শুধু নিজের বা ঈশ্বরের চোখে নয়, অন্য লোকদের চোখেও নিজেকে নিখুঁত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে উন্নত হওয়ার এই নেশা খুব দ্রুতই অন্য মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠার নেশায় রূপ নিল। আমি তাদের চেয়ে বেশি বিখ্যাত, গুরুত্বপূর্ণ আর সম্পদশালী হওয়ার নেশায় আক্রান্ত হলাম।

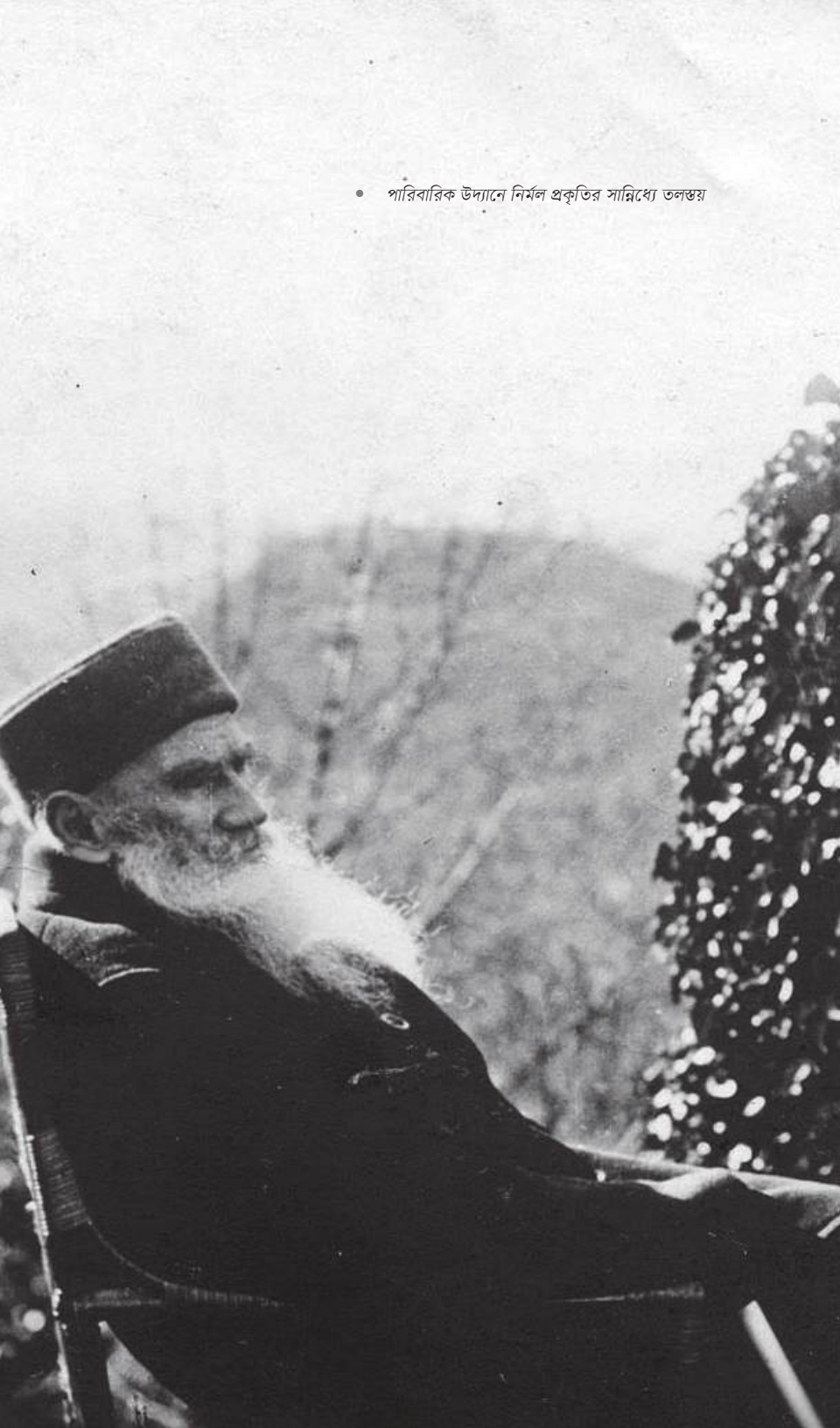

• *পারিবারিক উদ্যানে নির্মল প্রকৃতির সান্নিধ্যে তলস্তয়*

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোনো একদিন আমি সেই কাহিনি বলব, আমার যৌবনের সেই দশ বছরের করুণ এবং শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা। আমার ধারণা বেশিরভাগ মানুষই একই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যায়। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে আমি ভালো হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বয়স ছিল কম, আবেগ ছিল বেশি আর আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ; সত্যিকার কল্যাণ বলতে কী বোঝায়, এই বিষয়টা যখনই অনুসন্ধান করতে গিয়েছি, নিজেকে সম্পূর্ণ একা পেয়েছি। যতবার আমি সমগ্র অন্তর দিয়ে নৈতিকভাবে ভালো হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছি, ততবার আমি অবজ্ঞা আর ঠাট্টার শিকার হয়েছি। অন্যদিকে যখনই আমি হীন স্বার্থের কাছে হার মেনেছি, লোকের প্রশংসা এবং উৎসাহ পেয়েছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার লোভ, স্বার্থপরতা, কামুকতা, অহংকার, ক্রোধ, প্রতিশোধ-পরায়ণতা—এসবই অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছে বারবার। যখন আমি এসবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়েছি, আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের ফটোকপি হয়ে উঠেছি এবং তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার একজন হৃদয়বতী খালার সাথে আমি একসময় বাস করতাম। তিনি আমার দেখা অন্যতম চমৎকার একজন নারী। এই খালা প্রায়ই আমাকে বলতেন—তাঁর সবচেয়ে বড় চাওয়া হলো আমি যেন একজন বিবাহিতা নারীর সাথে সম্পর্কে জড়াই। আরো বলতেন, 'একজন ভদ্রমহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়ানো একজন যুবককে যতটা যুবক করে তোলে, ততটা আর কোনো কিছুই করে না।' আমাকে নিয়ে তাঁর আরেকটি ইচ্ছে ছিল আমি যেন উচ্চপদস্থ কারো সহকারী হই, সবচেয়ে ভালো হয় সম্রাটের সহকারী হলে। আর তিনি নাকি

সুযোগ পেলাম না কারণ তার আগেই ওই লেখকদের বিশেষভাবে যাপিত জীবন আমাকে গভীরভাবে গিলে নিল এবং আমিও ওই জীবনের অংশ হয়ে গেলাম। আগে যে উন্নততর জীবনের পরিকল্পনা আমি করেছিলাম, অচিরেই তাতে যবনিকাপাত ঘটল। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারালাম এবং ওই কলুষিত জীবনদর্শন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকলাম।

আমার সহচর লেখকরা যে তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন তা হলো এই : জীবন একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হয় এবং আমাদের মতো চিন্তাশীল মানুষরা ওই নির্ধারিত জীবনপথের সারবস্তুটা মানুষকে ধরিয়ে দেয়। এছাড়াও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে শিল্পী এবং কবিরা মানুষকে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন, আমরা শিল্পী এবং আমাদের কাজ হলো মানুষকে শিক্ষিত করা। এই তত্ত্ব এটাই বলত যে শিল্পী এবং কবিরা অবচেতনে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কাজেই অত্যন্ত জরুরি একটা প্রশ্নকে তাঁরা এড়িয়ে যেতেন। প্রশ্নটি হলো, 'আমি কী জানি আর কী-ই বা শেখাতে পারি?' যেহেতু আমি একজন প্রখ্যাত শিল্পী এবং কবি ছিলাম, আমিও একই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলাম। লেখক হিসেবে আমি মানুষকে শেখাতে চেয়েছিলাম, অথচ কী শেখাচ্ছি তা জানতাম না। এর বিনিময়ে আমি টাকা উপার্জন করেছি, উপাদেয় খাবারের স্বাদ পেয়েছি, আরামদায়ক বাসস্থানে থেকেছি, নারীসঙ্গ পেয়েছি, সামাজিক স্বীকৃতিতে ভেসে গিয়েছি। যেহেতু আমি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়েছিলাম সুতরাং ধরে নিয়েছিলাম আমি নিশ্চয় ভালো কিছুই শেখাচ্ছি। জনপ্রিয়তাকেই আমি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ধরে নিয়েছিলাম।

জ্ঞানের প্রতি, কবিতার প্রতি এবং জীবনের পরিবর্তনের প্রতি এই যে মাত্রাতিরিক্ত আস্থা, এটাও এক ধরনের বিশ্বাস এবং আমি ছিলাম এই বিশ্বাসের একজন প্রচারক, ধর্মপ্রচারকদের মতোই। এই ধর্মপ্রচারণা খুব লাভজনক এবং উপভোগ্য ছিল। এই বিশ্বাসের ভেতর আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি এবং কখনোই ওই জীবনকে সন্দেহ করিনি। কিন্তু এই জীবনের দ্বিতীয় এবং